ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2110-2115
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.472

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা: ন্যাশনাল থিয়েটার ও গিরিশ প্রসঙ্গ

সাফিউল্লা মোল্লা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.05.2026; Accepted: 07.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In December 1872, the journey of the public theatre began with the staging of *Nil Darpan*. Under the banner of the first National Theatre, entry to the theatre was opened to the general public in exchange for money. The main figures behind this initiative were Ardendusekhar Mustafi, Nagendranath Bandyopadhyay, Radhamadhab Kar, Dharmadas Sur, and others. Girish Chandra Ghosh, however, was not among them at the outset. He was not in favour of this practice of paying audiences watching performances like a "crowded marketplace," nor did he support the use of the name "National Theatre," which he felt could tarnish the dignity of Bengali theatre and expose its economic vulnerability. Nevertheless, the practice of paid theatre-going had already begun. Accounts of that first-day experience are found in various memoirs and autobiographical writings. Girish Chandra himself later joined the theatre, but in the capacity of an unpaid actor.

From a contemporary perspective, when we try to understand the ethos of the National Theatre and the theatrical vision of Girish, we see that he had dreamed of building a theatre culture but was opposed to turning it into a purely commercial enterprise. Yet, over time, theatre inevitably became commercialised. Even experimental theatre today reflects elements of semi-professionalism. Girish Chandra was aware of this possibility from the beginning. The central aim of this essay is to rediscover that vision and mindset.

Keywords: Public Theatre, National Theatre, Commercial cash-based theatre, Girishchandra ghosh, Amateur actor, Internal rivalry, Experimental theatre, Experimental theatre, People's theatre

উনিশ শতকের বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে বাগবাজারের শখের নাট্যসম্প্রদায় একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই নাট্যসম্প্রদায়ই প্রথমে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী (১৮৬৮) এবং পরবর্তীকালে লীলাবতী (১১ মে, ১৮৭২) নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলা নাগরিক নাট্যচর্চার এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। এই নাট্যসমাজ পরবর্তীকালে ন্যশনাল থিয়েটার[১] নাম গ্রহণ করে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই ঘটনাটি একটি যুগান্তকারী পর্ব, কারণ এর মধ্য দিয়েই প্রথমবার টিকিটের বিনিময়ে সাধারণ দর্শকের জন্য নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ফলত, নাটক অভিজাত গৃহমঞ্চের সীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে জনপরিসরভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে শুরু করে। এই তরুণ নাট্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর এবং ধর্মদাস সুর-এর মতো বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের

মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এই মুহূর্তেই নাট্যদলের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ দল থেকে সরে দাঁড়ান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের আপত্তি মূলত দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল— 'ন্যাশনাল' নামের ব্যবহার এবং টিকিট বিক্রির মাধ্যমে নাট্যপ্রদর্শনের আয়োজন। তাঁর মতে, 'ন্যাশনাল' শব্দটি সমগ্র জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত; অতএব, পর্যাপ্ত শিল্প-প্রস্তুতি, সাংগঠনিক পরিপক্কতা এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা ব্যতিরেকে এই নামের ব্যবহার বাংলা নাট্যচর্চার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। অর্থাৎ, তাঁর আপত্তি ছিল কেবল নামকরণগত নয়; বরং এর অন্তর্নিহিত ছিল জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্ন এবং নাট্যশিল্পের মানরক্ষা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা। একইভাবে টিকিট বিক্রির বিষয়েও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবস্থান ছিল নীতিগত। তিনি মনে করতেন যে, একটি সুসংগঠিত নাট্যগৃহ, উন্নত মঞ্চব্যবস্থা এবং উপযুক্ত অভিনয়-পরিকাঠামো নির্মাণের পূর্বে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাট্যপ্রদর্শন শুরু করা শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁর বক্তব্য— "থিয়েটারের জন্য একখানা ভালো বাড়ি না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না। আগে ভাল বাড়ি, ভাল স্টেজ কর, তারপর টিকিট কর, নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন?"[২]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ থিয়েটারকে নিছক জনপ্রিয় বিনোদনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেননি; বরং তিনি একে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার ভিত্তি হবে শিল্পের মান, অবকাঠামোগত পরিপূর্ণতা এবং সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা। সুতরাং, তাঁর আপত্তিকে বাণিজ্যিকীকরণের সরল বিরোধিতা হিসেবে দেখলে তা আংশিক ব্যাখ্যা হয়ে থাকবে; প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল অপরিকল্পিত নাট্য-অর্থনীতি এবং অসম্পূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ।

উনিশ শতকের বাংলা বাণিজ্যিক নাট্যচর্চার প্রারম্ভিক ইতিহাসে প্রতিষ্ঠানগত অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত এবং নেতৃত্বগত মতভেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক পরিসর নির্মাণ করে। এই প্রেক্ষিতে গিরিশ ঘোষের পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি দীর্ঘ সময় পর প্রাথমিক মতানৈক্যকে সরাসরি 'বিবাদ' হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং তাকে একটি সংগঠনগত ও কাঠামোগত ভিন্নমতের পরিণতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পুনর্মূল্যায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আর্থিক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব। সমকালীন উদ্যোগে টিকিট বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেবল প্রশাসনিক সমস্যা ছিল না; বরং তা নাট্য-প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা-সম্পর্ক ও স্বার্থবিন্যাসকেও প্রভাবিত করেছিল। এই প্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা বা আত্মসাৎ-প্রবণতার অভিযোগও সমকালীন বর্ণনায় উঠে আসে, যা উদ্যোগটির আদর্শগত ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এই আলোচনায় 'ক্যাশানল'[৩] ধারণাটি— শ্রী ব্রাত্য বসুর *অদামৃত কথা* থেকে গৃহীত— একটি ব্যাখ্যামূলক রূপক হিসেবে প্রাসঙ্গিক। ক্যাশের অনল বা অর্থের আগুন দ্বারা এখানে অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও তার বিধ্বংসী প্রভাবকে নির্দেশ করা হয়, যা নাট্যজগতের সহযোগিতামূলক কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভাজন সৃষ্টি করে। এই ধারণা অনুযায়ী, প্রারম্ভিক বাংলা থিয়েটারের সংকট কেবল নান্দনিক বা সাংস্কৃতিক ছিল না; বরং তা গভীরভাবে অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। তিনি প্রাথমিক পর্যায়েই উপলব্ধি করেন যে, পর্যাপ্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং প্রযোজনাগত পরিকাঠামো, উপযুক্ত উদ্যোগ ছাড়া বাণিজ্যিক নাট্যপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা কঠিন। হলও তাই- বর্ষা আর অর্থ, এই দুটি কারণে বন্ধ হয়ে গেল ন্যাশনাল থিয়েটার। উপযুক্ত উদ্যোগ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন তিনি? কেন তিনি সরে যাচ্ছেন? সকলে মিলে যখন এই উদ্যোগ নিচ্ছেন, তখন এমন মনে হতেই পারে গিরিশচন্দ্রের সাথে থাকা উচিত ছিল। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন আটাশ বছর। ইতিমধ্যে তিনি দাদা (১৮৫৪ সালে), মা (১৮৫৮ সালে), এবং বাবাকে (১৮৫৯ সালে) হারিয়েছেন।

পনের বছর (১৮৫৯ সালে) বয়সে বিয়ে করে ১৮৬৭ সালে অ্যাটকিনসন সাহেবের নীলের অফিসে কাজে ঢুকেছেন। উল্লেখ্য এই বছরেই বাগবাজারে একটি যাত্রা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ের জন্য মনোনীত হওয়ায় তিনি যাত্রার উপযোগী কিছু গানও রচনা করে দেন। একদিকে ব্যক্তিগত বেদনার করুণ আলেখ্য, অন্যদিকে দেশীয় নাট্যকে সাথে নিয়ে থিয়েটার করার আগ্রহ (অথচ ন্যাশনালে আপত্তি) দুইয়ের মাঝে গিরিশ মানস কে আবিষ্কার করা যায় সহজেই। তাঁর মনে যে জাতীয় মর্যাদা জ্ঞান ছিল, যে জাতীয় গৌরবের কল্পনায় মন বিভোর ছিল, অভিনয় ও নাটকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের যে পরিকল্পনা ছিল তাতে তিনি আঘাত হানতে দেননি। সেই দেশীয় সম্পদকে ভালোভাবে না চিনেই এতবড় উদ্যোগ নিতে গিরিশচন্দ্রের মন সায় দেয়নি। এটাও সত্য, যে চারজন ব্যক্তি ন্যাশনাল থিয়েটার করার পিছনে জড়িত তারা সকলেই ছিলেন গৃহস্থ পরিবারের সন্তান। এক ভুবনমোহন নিয়োগী, বয়স ১৫ বছর, এক বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ির মালিক, দুই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২২ বছর, তিন ধর্মদাস সুর, বয়স ২০ বছর, চার অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। এদের মধ্যে ভুবনমোহন নিয়োগীর বাবুয়ানি সে-যুগে বিশেষ একটা ব্যাপার ছিল। নীলদর্পণ অভিনয়ের পরের দিন (১৮৭২, ৮ই ডিসেম্বর) ভুবনমোহন গ্রান্ড সাকসেস পার্টির আয়োজন করেছিলেন। সাথে ছিল এই চারজন এবং ১০টি মদের বোতল (৫টি পোর্ট ও ৫টি শেরি), সাথে দুটি দিশির বোতল, "অর্ধেন্দু বাবুর আবার দিশি ছাড়া মুখে রোচে না।"[৪] এই সংশ্রবও গিরিশচন্দ্রের চিন্তার একটি কারণ ছিল বলে মনে হয়, কেননা কুমুদবন্ধু সেন যে গিরিশ লেকচার[৫] দিয়েছিলেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপে শিক্ষা অর্জন করেছেন, এবং সেইসাথে লোকচরিত্রের অধ্যয়ন, এবং মনস্তত্ত্বকে রপ্ত করেছেন। সুতরাং এটুকু বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ন্যাশনালের নাম করে থিয়েটার কোন পথে যেতে পারে।

শেষপর্যন্ত টিকিট বিক্রি করে অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল। টিকিটের মূল্য ছিল প্রথম শ্রেণী ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেনী ৫০ পয়সা। প্রথম রজনীতে টিকিট বিক্রি করে দুশো টাকা আয় হয়েছিল বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।[৬] কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত জানিয়েছেন সাতশ টাকার টিকিট বিক্রি হয়।[৭] কমবেশি যত টাকাই হোক না কেন অভিনয় করার মূল্য উঠে আসতে লাগল। অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হল "মাছের তেলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না।"[৮]এটাই তো চেয়েছিলেন। এখান থেকে দুটি বিষয় বেরিয়ে আসে। এক, সখের থিয়েটারে সাধারণ মানুষ অভিনয় দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, ন্যাশনাল থিয়েটার সেই সুযোগ সহজ করে দিল। থিয়েটার হয়ে গেল পাবলিক প্রোপার্টি। এই পাবলিক কারা ছিল? টাকার বিনিময়ে দেখানোর ফলে কি একশ্রেণীর অবুঝ দর্শকের ভিড় লক্ষ করা গেল না? অন্তত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাই মনে করতেন। তাঁর রচিত গান[৯] থেকে এটাই প্রতিভাত হয়- যথার্থ পেশাদারিত্ব না থাকলে সাধারণ মানুষ (এখানে তিনি যাদের নীচজাতি বলে ব্যঙ্গ করেছেন) টিকিট কেটে অভিনয় দেখলে অভিনয়ের সাফল্য বা গৌরব হ্রাস হয়।

গিরিশচন্দ্র যে পাবলিকের কথা বলতে চেয়েছেন, সত্যিই কি তাই ছিল? ১৮৭২ সালে কলকাতার কত শতাংশ লোক প্রতি সপ্তাহে নাটক দেখতেন তা হয়ত জানা যায় না, তবে এটুকু জানা যায় তখনকার থিয়েটারে উচ্চ, মধ্যবিত্তের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব ছিল। কেননা টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি। ন্যাশনাল থিয়েটারে শুরুতে টিকিটের হার ছিল যথাক্রমে- দুটাকা, একটাকা, আট আনা। পরে আরো বেড়ে যায়। গ্র্যান্ড অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার যে অভিনয়ের আয়োজন করেছিল তাতে টিকিটের মূল্য অনেক বেশি দেখা যায়, এমনকি ভিড় বেশি হলে চার টাকার টিকিট আট টাকাতেও পাওয়া যেত না, এমন তথ্যও জানা যায় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভারতীয় নাট্যমঞ্চ[১০] গ্রন্থে। এমনকি উইলিয়াম ডিগবির Prosperous British India[১১] বই থেকে

জানা যায় ১৮৫০ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু দৈনিক আয় ছিল দু-আনা, ১৮৮২ তে সেটা দাঁড়ায় দেড় আনা। এরকম অবস্থায় টিকিটের উচ্চ মূল্য দিয়ে নাটক দেখা একপ্রকার অসম্ভব ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে। তৎকালীন সোমপ্রকাশ পত্রেও উল্লেখ দেখা যায়- "আজিও বাঙ্গালীদিগের সেরূপ ধনবৃদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে এত ব্যয় করিতে পারেন।"[১২]

দ্বিতীয় যে বিষয়টি, উনিশ শতকের কলকাতার বাণিজ্যিক নাট্যচর্চার বিকাশপর্বে নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত নান্দনিক, প্রাযুক্তিক এবং আদর্শগত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষত টিকিট-নির্ভর থিয়েটারের উদ্ভবের পর নাট্যপ্রদর্শন কেবল সাহিত্যিক বা অভিনয়-নির্ভর অনুশীলন হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি সংগঠিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষিতে মঞ্চব্যবস্থা ও প্রযোজনাগত পরিকাঠামোর উন্নয়ন একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এই রূপান্তরপর্বে গিরিশ ঘোষের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমকালীন নাট্যচর্চার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে তিনি প্রাথমিক পর্যায়েই উন্নত মঞ্চব্যবস্থা, দৃশ্যসজ্জা এবং প্রযোজনাগত শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নাট্যপ্রদর্শন কেবল পাঠ্যনির্ভর সাহিত্যরূপ নয়, বরং একটি দৃশ্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতামূলক শিল্পমাধ্যম, যার জন্য উপযুক্ত মঞ্চপ্রযুক্তি ও প্রযোজনাগত প্রস্তুতি অপরিহার্য। তবে প্রারম্ভিক বাণিজ্যিক নাট্যপরিসরে এই প্রাযুক্তিক পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত ছিল না। ফলে নাট্যরচনার নির্বাচন ও প্রযোজনায় বাস্তবসম্মত সীমাবদ্ধতা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষিতে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* নাটকের নির্বাচন একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যাত্রা-অনুশীলনের অভিজ্ঞতা থেকে আগত গিরিশচন্দ্র যখন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাট্যপ্রযোজনার পরিকল্পনা করেন, তখন তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্য-জটিলতাযুক্ত নাটক নির্বাচন প্রযোজনাগত দিক থেকে সুবিধাজনক ছিল। *সধবার একাদশী*-তে জটিল দৃশ্যপরিবর্তন বা ব্যয়বহুল মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে সীমিত হওয়ায় তা প্রাথমিক বাণিজ্যিক মঞ্চের জন্য উপযোগী ছিল বলে গবেষকরা মত দেন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র তাঁর *শাস্তি কি শাস্তি?* নাটকের উৎসর্গপত্রেও সমকালীন প্রযোজনাগত সীমাবদ্ধতার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

একইভাবে, ন্যাশনাল থিয়েটারে যেটা দেখা যাচ্ছে মঞ্চব্যবস্থায় বিশাল কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। এডুকেশন গেজেটের সমালোচনা[১৩] থেকে জানা যায় সেকথা। এমনকি নাটক ভাবা হচ্ছে *নীলদর্পণ*। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি নিছক বিনোদনের জন্য এই পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে না, হচ্ছে একটা সামাজিক বার্তা দেওয়ার জন্য। অথচ এর সাথে গিরিশচন্দ্র জড়িত নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মতামত জেনে নিলে একটা জাতীয় ভাবনার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। যেমন নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত *ন্যাশনাল পেপার* (১১ ডিসেম্বর ১৮৭২) এটাকে 'The Event is of National Importance' বলছেন, *অমৃতবাজার পত্রিকা* (১২ ডিসেম্বর ১৮৭২) লিখছেন নীলদর্পণ অভিনীত হোক মফঃস্বলে। কলকাতার তুলনায় মফঃস্বলে এই নাটক দেখানো বেশি প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হল এতকিছু কারণ দেখিয়ে যে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, কিছুদিন পরেই (ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ, ১৮৭৩) আবার তিনি সেখানে যোগ দিলেন *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে ভীমসিংহের চরিত্রে অভিনয়ের (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) জন্য। এবং এই শর্তে তাঁর নাম হ্যান্ডবিলে ছাপা হবে A Distinguished amateur হিসেবে। তাঁর অবৈতনিক পরিচয়কে গুরুত্ব দিতেই এমন সিদ্ধান্ত। এছাড়াও তিনি এসময় কর্মসূত্রে সদাগরি অফিসের সঙ্গে যুক্ত, ফলে থিয়েটারে পেশাদারি হিসেবে তাঁর নাম যুক্ত হওয়া উচিত নয়। ৯ই মার্চ ১৮৭৩ সালে কৃ*ষ্ণকুমারীর* শেষ অভিনয়ের সাথে সাথে স্যান্যাল ভবনে ন্যাশনাল থিয়েটারের ভাঙন দেখা দিল- হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার এবং ন্যাশনাল নামে। ন্যাশনাল নামটি রেজিস্ট্রি করিয়ে স্বয়ং গিরিশ ঘোষ নীলদর্পণ অভিনয় করেন (২৯ মার্চ ১৮৭৩)। এরপর দুটি দল মিলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, আবার

প্রতাপচাঁদের সহায়তায় ন্যাশনাল থিয়েটার নির্মাণ। প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে যোগ দিয়ে গিরিশচন্দ্র প্রথমেই উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁর বন্ধুমন্ডলীকে একই মঞ্চের অধীনে আনতে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ছাড়া (কলকাতায় ছিলেন না) সকলেই এসে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিলেন। *হামির* (১ জানুয়ারি ১৮৮১) নাটকের মধ্য দিয়ে ন্যাশনালের নতুন পর্যায় শুরু হল। গিরিশচন্দ্র এই পর্বে ন'টি নাটক এবং ছ'টি গীতিনাট্য লেখেন। এও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, ১৮৮৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি *রাবণবধ* অভিনয়ের পর প্রতাপচাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নাট্যদলের ক্রমাগত বিভাজন, পুনর্গঠন এবং নতুন নামে আত্মপ্রকাশের প্রবণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই দল ভাঙাভাঙিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে বাস্তবে এই নাট্য পরিসরটি মূলত সীমিত সংখ্যক নাট্যব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। একই শিল্পী, সংগঠক এবং নাট্যচিন্তকদের ঘিরে মতবিরোধ, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক অসঙ্গতি এবং শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে নতুন নতুন দল গঠিত হয়েছে এবং পুনরায় ভেঙেও পড়েছে। তবে এই ভাঙাগড়াকে কেবল সাংগঠনিক অস্থিরতা হিসেবে বিচার করলে বাংলা থিয়েটারের বিবর্তনকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়; বরং এই ধারাবাহিক বিভাজন ও পুনর্গঠনই বাংলা নাট্যচর্চার অন্তর্নিহিত সৃজনশীল গতি হিসেবে কাজ করেছে। নতুন নাট্যভাষা, নতুন মঞ্চ-ভাবনা এবং বিকল্প সাংস্কৃতিক অবস্থানের অনুসন্ধান এই ভাঙনের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এবং 'পাবলিক' দর্শককে কেন্দ্র করে বাংলা থিয়েটারের যে নতুন সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়, তার মধ্যেই একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব নিহিত ছিল। 'ন্যাশনাল' নাম গ্রহণের মাধ্যমে থিয়েটারকে জনসমাজের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল, সেই প্রচেষ্টার মধ্যেই জনসম্পৃক্ততা ও শিল্পমানের প্রশ্ন পরস্পরের সঙ্গে জটিল সম্পর্ক গড়ে তোলে। থিয়েটার যত বেশি দর্শকনির্ভর হয়েছে, ততই শিল্পের পরীক্ষামূলক চরিত্র এবং সাধারণ দর্শকের গ্রহণক্ষমতার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ফলে বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে 'পাবলিক থিয়েটার' এবং 'এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার'-এর মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়।

পরবর্তীকালে বাংলা থিয়েটারে যে 'এক্সপেরিমেন্টাল' বা পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার বিকাশ ঘটে, তা মূলত বাণিজ্যিক পাবলিক থিয়েটারের বিপরীতে একটি বিকল্প নাট্যভাষা নির্মাণের প্রয়াস ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষামূলক নাট্যধারাও ক্রমশ সাধারণ দর্শকের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমকালীন পরিস্থিতিতে এসে এই সংকট আরও প্রকট হয়েছে। ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে 'থিয়েটার' বলতে কী বোঝায়— এই প্রশ্ন আর একরৈখিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। একসময় যে 'গ্রুপ থিয়েটার' বিকল্প ও সমাজমনস্ক নাট্যচর্চার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বর্তমানে তার মধ্যেও আধা-পেশাদারিত্বের প্রবণতা সুস্পষ্ট। দলগত শিল্প-অনুশীলনের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তা, অভিনয়শিল্পীর পরিচিতি এবং বাজারনির্ভর দর্শক-সংস্কৃতি নাট্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠেছে। এর ফলে সমকালীন থিয়েটারকে 'এক্সপেরিমেন্টাল' না 'বাণিজ্যিক— এই প্রশ্ন নতুনভাবে উত্থাপিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, বাংলা থিয়েটারে একসময় পাবলিক থিয়েটার এবং এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার— এই দুই পৃথক ধারার অস্তিত্ব ছিল। পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার উৎস অনুসন্ধান করলে তার সঙ্গে আইপিটিএ-এর ঐতিহাসিক সম্পর্ক অনস্বীকার্য। গণনাট্য আন্দোলন মূলত বাণিজ্যিক পাবলিক থিয়েটারের বিরোধী এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা, শ্রেণিগত বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দমননীতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেই গণনাট্যের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তীকালে আইপিটিএ থেকে বিচ্ছিন্ন নাট্যকর্মীরাই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সূচনা করেন, যা বাংলা থিয়েটারে বিকল্প নন্দনতত্ত্ব, সমাজমনস্ক নাট্যচিন্তা এবং রাজনৈতিক নাট্যভাষার ভিত্তি নির্মাণ করে।

এই সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তিনিই সম্ভবত প্রথম নাট্যব্যক্তিত্ব যিনি থিয়েটারকে অভিজাত সাংস্কৃতিক অনুশীলনের গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাট্যভাবনার কেন্দ্রে ছিল জনগণনির্ভর সাংস্কৃতিক চর্চা। সেই কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ন্যাশনাল নাম গ্রহণের মধ্য দিয়েই কোনও নাট্যপ্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে জাতীয় হয়ে ওঠে না; বরং যেখানে প্রকৃত গণসমর্থন, জনসম্পৃক্ততা এবং সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়, সেখানেই থিয়েটার ধীরে ধীরে জাতীয় চরিত্র অর্জন করে। অর্থাৎ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যদর্শন একদিকে যেমন শিল্পমান ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে, অন্যদিকে তেমনি জনগণের সঙ্গে থিয়েটারের জৈব সম্পর্ককেও গুরুত্ব দেয়। এই দ্বৈত অবস্থানই তাঁকে বাংলা পাবলিক থিয়েটারের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ও সুদূরপ্রসারী নাট্যচিন্তার ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১) "সধবার একাদশী অভিনয়কালে এই সম্প্রদায়ের নাম 'The Bagbazar Amateur Theatre' ছিল। 'লীলাবতী' অভিনয়কালে ঐ নাম বদলাইয়া 'The Calcutta National Theatre' পরে Calcutta বাদ দিয়া 'The National Theatre' নামকরণ হয়। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সময়ে লীলাবতী সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। ইহারই প্রস্তাবে 'The Calcutta National Theatre' নাম রাখা হয়। কিন্তু অভিনেতা মতিলাল সুর মহাশয় বলিলেন, আবার Calcutta কেন? শুধু National Theatre নাম রাখা হউক।" (গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, স. মজুমদার, স্বপন, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯২৭, পৃ. ৬৩)।

২) মিত্র, ড. অরুণকুমার। অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি। সাহিত্যলোক, জানুয়ারি, ১৯৫৭, পৃ. ৫০।

৩) বসু, ব্রাত্য। অদামৃত-কথা। প্রতিদিন, ২৮ নভেম্বর ২০২১, (ধারাবাহিক উপন্যাস), পৃ. ২৯।

৪) তদেব, পৃ. ৩১।

৫) সেন, শ্রীকুমুদবন্ধু। গিরিশচন্দ্র। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৩

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, প্রথম সংস্করণ- ১৩৪০, পৃ. ১০৫।

৭) দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ। দ্য ইন্ডিয়ান স্টেজ। কলকাতা, ১৯৩৮, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৯০-৯১।

৮) "ইহা খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সখের অভিনয় নহে- নীলদর্পনের অভিনেতৃগন... টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়-সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন।"

৯) "লুপ্তবেনী বইছে তেরোধার/ভাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার।। নগ হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীনকায়,/বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়; শিবশম্ভূসূত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার।। কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান, অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান, অবিনাশী মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান; সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু করো পার।। কিবা বালুময় বেলা/ পালে পালে রেতের বেলা /ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা; মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্চে সার।। কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে, বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে,/ স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।"

১০) দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ। দ্য ইন্ডিয়ান স্টেজ। কলকাতা, ১৯৩৮, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৯৪।

১১) Digby william, Prosperous British India, 1901, paternoster square, london, page- 534

১২) সোমপ্রকাশ, ১৯ ফাল্গুন ১২৮০, বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৬৮৭।

১৩) "অধিকাংশ দৃশ্যগুলি ন্যাশানাল থিয়েটারের উপযুক্ত হয় নাই। কারণ জাতীয় চিত্রের আদর্শ সকল স্থাপন করাই কর্তব্য। গোলাঘরের সম্মুখ ও কুটির দপ্তরখানার সম্মুখের চিত্র দুইখানি মন্দ নহে। অনেক গৃহের পার্শ্ববর্তী দৃশ্য (wings) না থাকাতে গৃহের সৌন্দর্যের হ্রাস হইয়াছিল, এবং কোন কোন গৃহের দৃশ্যও অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই।"